একমাত্র ধর্ম

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী (র)

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগকে আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধানের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত করাই মুসলিমের কর্তব্য।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এ শতকের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণা বৈজ্ঞানিক যুক্তি ধারার ভিত্তিতে অপনোদন করেছেন। তিনি ১৯৪৩ সনে দিল্লীর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়ায়ে মিল্লীয়া'র এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এ সম্পর্কে এক উচ্চাংগের ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এতে তিনি বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের জন্য একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা অপরিহার্য এবং তা ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পর্যায়ে তিনি যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অবতারণা করেছেন, সমসাময়িক মনীষীদের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বলাবাহুল্য, আকারে ক্ষুদ্র হলেও পাণ্ডীত্যের মহীমায় ও চিন্তার গভীরতায় 'একমাত্র ধর্ম' পুস্তিকাখানি এক অতল স্পর্শ সমুদ্র।

আশা করি পুস্তিকাটির এ সংস্করণও সুধী মণ্ডলীর নিকট আগের মত সমাদৃত হবে।

—প্রকাশক

একমাত্র ধর্ম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

একমাত্র ধর্ম

কুরআন শরীফ সমগ্র মানব জাতিকে তার নিজ প্রচারিত জীবনাদর্শের দিকে এই বলে আহ্বান জানাচ্ছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

এ ছোট্ট আয়াতটুকু এ পুস্তকে আমার আলোচ্য বিষয়। বিস্তারিত করে বলার স্থান এটা নয়, যথাসম্ভব সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো। এ আয়াতটুকুতে প্রকৃতপক্ষে কি দাবী উত্থাপন করা হয়েছে, তা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যাবে। উপরন্তু সেই দাবী গ্রহণ করা উচিত কিনা সে বিষয়েও বিশেষ আলোচনা করবো এবং কুরআনের এ দাবী মেনে নিলে কি কি কাজ করা আমাদের কর্তব্য হয়, তাকে বিশ্বাস করলে কিভাবে মানবজাতির জীবনকে গঠন করা বাঞ্ছনীয় হয়, সর্বশেষে আমি তাও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

সাধারণত এ ছোট আয়াতটির খুব সাদাসিদে অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আবহমানকাল হতে আপনারা এর অর্থ শুনে এসেছেন, "আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম হচ্ছে শুধু ইসলাম।" আর ইসলাম সম্পর্কে সাধারণভাবে সকলেরই মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা আজ হতে সাড়ে তেরোশত বছর পূর্বে আরব দেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং যার প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। "প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন"

কথাটি আমি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি। কারণ, কেবল অমুসলিমগণই নয়, অসংখ্য মুসলমান এবং ভাল ভাল শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মুসলমান পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স)-কে "ইসলামের প্রবর্তক ও ভিত্তিস্থাপক" বলে মনে করেন এবং বই-পুস্তকে সে কথাই নানাভাবে লিখে থাকেন। তাদের বিশ্বাস হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই ইসলামের সর্বপ্রথম প্রচারক—দুনিয়াতে তিনিই তার প্রথম ভিত্তিস্থাপন করেছেন। এজন্যই একজন অমুসলিম ব্যক্তি কুরআন শরীফ অধ্যয়নকালে যখন এ আয়াতটি পাঠ করে, তখন সে ধারণা করে যে, দুনিয়ার সকল ধর্মই যেমন কেবল নিজেকেই 'একমাত্র সত্য ধর্ম' বলে অভিহিত করে থাকে এবং অন্যান্য ধর্মকে বাতিল বলে মনে করে অনুরূপভাবে কুরআনও নিজের উপস্থাপিত ধর্মের একমাত্র সত্য হওয়ার দাবী করেছে, এটা বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম পাঠক এ ধারণার বশবর্তী হয়ে খুব দ্রুততার সাথেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যায়—এ দাবীর মৌলিকতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করে না। পক্ষান্তরে একজন মুসলিমও এ সম্পর্কে চিন্তা করার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা এজন্যই বোধ করে না যে, এ আয়াতে যে ধর্মকে 'একমাত্র সত্য ধর্ম' বলে দাবী করা হয়েছে, সে নিজেও তাকে সত্য ধর্ম বলেই বিশ্বাস করে। কারো মনে কোনো সময় এ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তাবোধ হলেও সে কেবল খৃষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং এরূপ অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনা করে তার সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফের এ ছোট্ট আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে যতটুকু চিন্তা করা হয়েছে তদপেক্ষা অনেক বেশী চিন্তা করা একান্ত আবশ্যক।

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের দাবীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম 'আ-দ্বীন' (الدِّين) এবং 'আল-ইসলাম' (الاسلام) এ দু'টি শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব বিস্তারিতরূপে বুঝে নিতে হবে।

আ-দ্বীন (الدين) শব্দের বিশ্লেষণ

আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার এক অর্থ প্রভুত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ প্রতিফল ও কর্মফল এবং চতুর্থ অর্থ পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন।

উল্লেখিত আয়াতে 'দ্বীন' (دين) শব্দটি এ শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'দ্বীন' শব্দের অর্থ জীবন যাপনের পন্থা কিংবা কর্মের প্রণালী—এমন পন্থা বা প্রণালী যা মানুষের জীবনে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কুরআন কেবল 'দ্বীন'ই বলেনি—কুরআন বলছে, 'আ-দ্বীন' (الدين)। ইংরেজী ভাষ This is a way (এই একটি পথ)-এর পরিবর্তে This is the way (এ একমাত্র পথ) বলায় অর্থের দিক দিয়ে যতখানি পার্থক্য হয় 'দ্বীন' (دين) এবং 'আ-দ্বীন' (الدين) শব্দের মধ্যেও অর্থের দিক দিয়ে ঠিক ততখানি পার্থক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন একথা বলছে না যে, "ইসলাম আল্লাহর নিকট একটি (মনোনীত) ধর্ম" বরং তার দাবী, "আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র প্রকৃত, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা বা চিন্তা ও কর্মের প্রণালী।" এছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন এ 'আ-দ্বীন' শব্দটি কোনো সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেনি, কুরআনে তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

'জীবন ব্যবস্থা' বলতে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা বিশেষ কোনো বিভাগের ব্যবস্থা বুঝায় না, তার অর্থ সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা–স্বতন্ত্রভাবে কেবল এক একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবস্থা নয়, তা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজের ব্যবস্থাই বুঝায়। বিশেষ কোনো দেশ বা বিশেষ কোনো জাতি বা বিশেষ কোনো কাল ও যুগের জীবন ব্যবস্থা নয়, বরং সকল কালের সকল মানুষের এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজের ব্যবস্থার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অতএব পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, কুরআনের উক্ত দাবীর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম আল্লাহর নিকট পূজা-উপাসনা, অতি প্রাকৃতিক ধারণা-বিশ্বাস এবং পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের একটি সমষ্টি মাত্র, তার অর্থ এটাও নয় যে, ব্যক্তি মানুষের ধর্মীয় চিন্তা কর্মপদ্ধতির (বর্তমান পাশ্চাত্য পরিভাষায় 'ধর্মীয়' শব্দটি যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে) একটি রূপ হচ্ছে ইসলাম। পক্ষান্তরে তার অর্থ এটাও নয় যে, কেবল আরববাসীদের জন্য কিংবা একটি নির্দিষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত অথবা একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, যথা শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী মানুষদের জন্য ইসলাম একটি বিশুদ্ধ জীবনব্যবস্থা ; বরং কুরআন শরীফ স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্তকণ্ঠে দাবী করছে যে, "প্রত্যেক কালের অধ্যায়ের সমগ্র মানবজাতির জন্য পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য এবং মানব জীবনের সমগ্র বিভাগের জন্য একটি মাত্র পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ ও মনোনীত, সেই স্বাভাবিক পদ্ধতিরই নাম হচ্ছে ইসলাম।"

আমি শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি যে, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী কোনো এক দেশে কুরআন শরীফের এক নূতন তাফসীর প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, 'দ্বীন' (دين)

শব্দটিতে শুধু আল্লাহ ও মানুষের মধ্যস্থিত ব্যক্তিগত সম্পর্কিত বিষয় বুঝায়—রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনের বিপুল ক্ষেত্রের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এ তাফসীর যদি কুরআন হতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই দেখার বস্তু বটে কিন্তু আমি দীর্ঘ অষ্টাদশ বছরকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে, বিশেষ যত্ন ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে কুরআন শরীফের যে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করেছি, তার উপর নির্ভর করে আমি অকুতোভয়ে ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারি যে, কুরআন এসব নতুন তাফসীরকারদের স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করে "আ-দ্বীন" (الدين) শব্দটিকে কোনো সীমাবদ্ধ অর্থে আদৌ ব্যবহার করেনি ; বরং তাকে সমগ্র কালের সমগ্র মানুষের জন্য, মানুষের চিন্তা ও কর্মের একমাত্র সুষ্ঠু বিধান বলে ঘোষণা করেছে।

আল ইসলাম (الاسلام)

এখন 'ইসলাম' শব্দটির আলোচনা করা যাক। আরবী ভাষায় 'ইসলাম' (اسلام) অর্থ আত্মসমর্পণ করা, নত হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা, নিজের ইচ্ছায় নিজেকে কারো নিকট সোপর্দ করে দেয়া। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কুরআন শুধু 'ইসলাম' বলেনি, তার সাথে আলিফ-লাম যোগ করে 'আল ইসলাম' বলেছে ; এটা কুরআনের একটি পরিভাষা। অতএব এ বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর সম্মুখে নত হওয়া, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর নিকট নিজের যাবতীয় আযাদী পরিত্যাগ করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই নিকট সমর্পণ করে দেয়া। কিন্তু এ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকার করার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মের (Law of Nature) সম্মুখে নিজেকে

সোপর্দ করে দেয়া নয়—যারা এ অর্থ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে তারা ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে মানুষের নিজের চিন্তা-কল্পনা, নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশের কাল্পনিক ধারণার আনুগত্য করাও নয়—যদিও ভুলবশতঃ কোনো কোনো লোক এরূপ ধারণা করে থাকে। বস্তুত তার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের রাসূলের মারফতে মানুষের জন্য যে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি নাযিল করেছেন, সম্পূর্ণরূপে তা-ই গ্রহণ করা এবং নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, অন্য কথায় চিন্তা ও কর্মের বিশিষ্টতা পরিত্যাগ করে তার আনুগত্য কবুল করাই আল্লাহর মনোনীত ও মনঃপুত পন্থা। একথাটিই কুরআন 'আল ইসলাম' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'ইসলাম' নতুন যুগের সৃষ্ট কোনো ধর্ম নয় এবং আজ হতে সাড়ে তেরোশত বছর পূর্বে আরব দেশে হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক তার প্রথম বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিল এমন ধারণা করাও মারাত্মক ভুল। বস্তুত সর্বপ্রথম যেদিন এ ভূ-পৃষ্ঠে বসতি শুরু হয়েছে, সেদিনই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, তোমাদের জন্য এ 'আল ইসলাম'-ই একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। অতপর দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক যুগের মানুষকে পথনির্দেশনার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যত নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই নির্বিশেষে এ এক 'আল ইসলাম'-এর দিকে নিখিল মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। আর সর্বশেষে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও এদিকেই সকল মানুষকে পথনির্দেশ করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, হযরত মূসা (আ)-এর অনুগামীগণ পরবর্তীকালে অসংখ্য বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণে 'ইয়াহুদী' নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম রচনা করে নিয়েছে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনুবর্তীগণও তদ্রূপ এক 'খৃষ্ট ধর্মের'

উৎপত্তি করে নিয়েছে। এরূপে ভারত বর্ষ, ইরান, চীন এবং অন্যান্য দেশে প্রেরিত পয়গাম্বরদের উম্মতগণ বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন নামে এক একটি ধর্ম রচনা করে নিয়েছে। কিন্তু এ মূসা (আ), ঈসা (আ) এবং অন্যান্য জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামই সম্মিলিতভাবে এ এক ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন—অন্য কিছুর দিকে নয়।

কুরআনের দাবী

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর কুরআনের দাবী অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মোটামুটি তার দাবী এ দাঁড়ায়, "আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করা এবং আল্লাহর প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের মারফত প্রদর্শিত চিন্তা ও কর্মনীতি অনুসরণ করে চলাই নিখিল মানবজাতির জন্য একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বা ধর্ম।

বস্তুত এটাই কুরআনের ঐকান্তিক দাবী। এ দাবী সত্যই গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিশেষ বিচক্ষণতার সাথে আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। স্বয়ং কুরআনের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি উপস্থিত করেছে, সেগুলো তো আমাদের যাচাই করতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে নিজেদের চিন্তা ও গবেষণাশক্তি প্রয়োগ করতে আমরা একবার একথার বিচার করে দেখতে পারি যে, কুরআনের এ দাবীকে দ্বিধাহীনচিত্তে কুবল করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় সত্যি কি আমাদের আছে ?

জীবন ব্যবস্থার আবশ্যকতা

দুনিয়াতে মানুষের সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা অপরিহার্য, এটা প্রমাণ করতে বিশেষ কোনো যুক্তি-প্রমাণ

উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হয় না। মানুষ নদী নয়, তাই নদীর ন্যায় তার পথ মাটির চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে আপনা আপনিই সুনির্দিষ্ট হয়ে যেতে পারে না। মানুষ বৃক্ষ নয়—বৃক্ষের মত তার পথ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নির্ধারিত হতে পারে না। মানুষ নিছক পশুও নয়, পশুর জন্য কেবল জন্মগত প্রকৃতির পথনির্দেশই যথেষ্ট–মানুষের জন্য নয়। মানুষ যদিও তার জীবনের একটি বিরাট অংশে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তবুও সে তার জীবনের অন্যান্য অসংখ্য বিভাগে পশুর ন্যায় কোনো বাধাধরা নিয়মে এক কদমও চলতে পারে না। বস্তুত এ বিভাগসমূহে তার সম্মুখে অসংখ্য পথের দূয়ার উন্মুক্ত হয়ে থাকে, তাকে তা হতে একটি পথ নির্বাচন করে গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের সম্মুখে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য অসংখ্য জটিল বিষয় উপস্থাপন করে, কিন্তু সেগুলোর কোনো স্পষ্ট সমাধান পেশ করে না। সে বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে সুষ্ঠু মীমাংসা করে নেয়ার জন্য মানুষের জন্য একটি সুস্পষ্ট চিন্তা-পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব-জ্ঞান মানুষের সম্মুখে মস্তিষ্কে জড়িভূত হয়; কিন্তু সেগুলো একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট হয়ে থাকে—প্রকৃতি সেগুলোকে সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ করে দেয় না। তাই সে জ্ঞানরাশিকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট পথ আবশ্যক। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের স্বভাব তার নিকট অসংখ্য ও বিভিন্ন দাবী পেশ করে, কিন্তু সেই দাবীগুলো পূর্ণ করার কোনো সুনির্দিষ্ট পথ সে পায় না। এ কারণে মানুষের ব্যক্তিগত আচার-আচরণের জন্য একটি মূলনীতি নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তার পারিবারিক জীবনের জন্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য,

অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের জন্য, দেশ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এবং জীবনের অন্যান্য অসংখ্য বিভাগের জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট পথ অপরিহার্য। যে পথে মানুষ কেবল ব্যক্তিগতভাবেই নয়—একটি দল, একটি জাতি, একটি গোষ্ঠী হিসাবেও চলতে পারবে। স্বাভবগত নিয়ম অনুসারে মানব জীবনের বহু উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু স্বভাব নিয়ম সেই উদ্দেশ্যগুলো সুস্পষ্টরূপে তার সম্মুখে পেশ করে না এবং সে উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য স্বভাব-নিয়ম কোনো পথও নির্দিষ্ট করে দেয় না।

মানব জীবনের অখণ্ডত্ব

মানব জীবনের অসংখ্য দিক ও বিভাগে একই নিয়ম ও বিধান অবলম্বন করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ প্রকৃতপক্ষে এদিক ও বিভাগগুলো পরস্পর বিরোধী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পরের প্রতি অনির্ভরশীল নয়। এজন্যই তার কোনো একটি ক্ষেত্রেও মানুষ আলাদা পথ ও বিভিন্ন প্রকারের বিধান অবলম্বন করতে পারে না। মানুষ যদি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করে এবং সে মত ও পথের প্রত্যেকটির লক্ষ্য ও পাথেয় যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, সে পথে চলার ধরন ও পন্থা যদি বিভিন্ন হয়, সে পথে চলার উদ্দেশ্যও যদি ভিন্নতর হয় এবং তার লক্ষ্য ও মঞ্জিল মকসুদও যদি আলাদা হয়, তবে মানুষের জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়তে বাধ্য। মানুষ এবং মানব জীবনের সমস্যাগুলো যদি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর মননশীলতার সাথে বুঝতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষ নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে এবং মানতে বাধ্য হবে যে, মানব জীবন সামগ্রিকভাবে একটি অবিভাজ্য সত্তা। তার প্রত্যেকটি

দিক ও বিভাগ এবং প্রত্যেকটি অংশই পরস্পরের সাথে এক গভীর ও অটুট বন্ধনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ অংশ ও বিভাগগুলোকে কিছুতেই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এরা পরস্পরের উপর অনিবার্যরূপে প্রভাবশীল ও একটি অপরটি কর্তৃক প্রভাবান্বিত। এদের সকলের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হয়। একই প্রাণশক্তি সবগুলোকেই সঞ্জীবিত ও সচেতন করে রাখে এবং এগুলোর নিবিড় সম্মিলনে যে বস্তুটি সৃষ্টি হয়, তারই নাম জীবন। কাজেই মানুষের অসংখ্য লক্ষ্য ও বিবিধ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন নেই —তার জন্য চাই একটি মাত্র কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। সে একই উদ্দেশ্যের সাথে ছোট-বড় সমগ্র উদ্দেশ্যই পূর্ণ আনুকুল্য ও সাম স্যের সাথে এমনভাবে যুক্ত ও মিলিত হবে যে, সে একই উদ্দেশ্য লাভের সাধনার ফলে অন্যান্য সমগ্র উদ্দেশ্যই আপনা আপনি লাভ হতে পারবে। মানুষের জন্য অসংখ্য পথের আবশ্যকতা নেই— তার প্রয়োজন শুধু একটি মাত্র পথ, যে পথে সে তার সমগ্র জীবনকে জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে নিয়ে পূর্ণ ঐক্য ও সাম স্য সহকারে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে চলতে পারবে। চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইত্যাদির জন্য মানুষের আলাদা আলাদা মত, পথ ও নীতির কোনো প্রয়োজন নেই। তার জন্য চাই একটি ব্যাপক ব্যবস্থা, যার অধীনে এ সমস্ত দিক পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সাথে একত্রিত ও মিলিত হবে। সেই ব্যাপক ব্যবস্থায় মানুষের এ সমগ্র বিভাগের জন্য একই প্রকৃতি এ ভাবধারা সমন্বিত আলাদা আলাদা ব্যবস্থা বর্তমান থাকবে, যা অনুসরণ করে ব্যক্তি তথা মানব জাতি এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতা তার উচ্চতম ও চরম লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। বর্বরতার

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে মানব জীবনকে বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ বিভাগে বিভক্ত করা সম্ভব বলে মনে করা হতো। এ যুগেও যদি এ ধরনের অর্থহীন মতাবলম্বী লোক বর্তমান থেকে থাকে, তবে হয় তারা একান্তভাবে প্রাচীন মতের অন্ধ আবেষ্টনীতে এখনও বসবাস করছে, অতএব, তারা দয়ার পাত্র ; নয়ত তারা প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পেরেও বিশেষ কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ অবলীলাক্রমে প্রচার করে যাচ্ছে। তারা একথা বলতে পেরেছে যে, মানব সমাজে তারা যে ব্যবস্থার প্রচলন করতে ইচ্ছুক, তার বিরোধী মতাবলম্বী অসংখ্য লোক সেই সমাজে বর্তমান। সেসব লোককে প্রতারিত করার জন্য তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলে বেড়ায় যে, তোমরা আমাদের উপস্থাপিত ব্যবস্থায় তোমাদের জীবনের প্রিয় ক্ষেত্রগুলোতে পূর্ণ আযাদী ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। অথচ জীবনের বিশেষ বিশেষ বিভাগে এক ধরনের বিধান অনুসরণ করলে অন্যান্য কয়েকটি বিভাগে সে বিধানকে অমান্য করে চলা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী এবং কার্যত তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার মনে হয়, এ ধরনের কথা যারা বলে বেড়ায়, তারা নিজেরাও মর্মে মর্মে বুঝতে পারে যে, এটা বস্তুতই সম্ভব নয় ; প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাই জীবনের সমগ্র বিভাগকে তার নিজের ভাবধারা ও প্রকৃতির অনুরূপ ঢেলে সাজায়, লবণের খনিতে যাই পড়বে, খনি তাকেই লবণে পরিণত করে নিবে, তা সর্বজনবিদিত সত্য।

জীবনের ভৌগলিক ও গোত্রীয় বিভাগ

মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করার কথা যেমন অর্থহীন জীবনকে ভৌগলিক আঞ্চলিকতায় কিংবা গোত্রীয় পরিসীমায় বণ্টন করা তদপেক্ষা বেশী অর্থহীন। মানুষ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত

হয়ে আছে ; নদী, পর্বত, জংগল ও সমুদ্র কিংবা কৃত্রিম সীমারেখা তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। পক্ষান্তরে মানুষের অসংখ্য গোত্র ও অসংখ্য জাতি এ দুনিয়াতে বর্তমান এবং ঐতিহাসিক, মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য অসংখ্য কারণে মানবতার বিকাশ ও প্রকৃতি তাদেরকে বিভিন্ন রূপ দান করছে তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু এ বিভিন্নতাকে ভিত্তি করে যারা বলে যে, প্রত্যেক গোত্র, প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের জন্য এক এক প্রকার জীবন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তারা নির্বোধ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাদের স্থূল ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টি কেবল মাত্র বাহ্যিক প্রকাশ, বাহ্যিক বাঁধা-বন্ধন ও বাহ্যিক কারণ বৈষম্যকেই বড় করে দেখেছে, এ বাহ্যিক বহুত্বের অভ্যন্তরে মানবতার মহান সত্তার অবিভাজ্য ঐক্য তাদের গোচরীভূত হয়নি। এসব বাহ্যিক বৈষম্য যদি বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং তার ভিত্তিতে যদি মানুষের জীবন ব্যবস্থাও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়, তাহলে মানুষকে একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। দু' দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এবং দু' গোত্রের লোকদের মধ্যে যে বৈষম্য ও পার্থক্য বর্তমান তা একদিকে রাখুন, অন্যদিকে শুধুমাত্র নারী-পুরুষের মধ্যে দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং একই মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাও লিপিবদ্ধ করুন। অতপর এ উভয় প্রকার পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করুন। আমি দাবী করে বলতে পারি, এ উভয় প্রকার পার্থক্যের মধ্যে প্রথম প্রকার অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের পার্থক্য অত্যন্ত গভীর ও স্পষ্ট বলে প্রমাণিত হবে। একথা সত্য হলে বলতে হবে যে, আলাদাভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই জীবনব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। অথচ এটা যে প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী, তা আপনিও

স্বীকার করবেন। কিন্তু আপনি যখন অসংখ্য ব্যক্তি, অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ এবং অসংখ্য পরিবারের মধ্যে এমন এক স্থায়ী ঐক্য ও সাম স্য লক্ষ্য করেন যার ভিত্তিতে জাতি, অঞ্চল কিংবা গোত্রীয় মতবাদ গড়ে উঠতে পারে এবং সে ধরনের বুনিয়াদে একটি জাতি কিংবা একটি অঞ্চলের অসংখ্য অধিবাসীর জন্য একই প্রকার জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ যোগ্য বলে মনে করেন—তখন জাতি, গোত্র এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের মধ্যে একটি বিরাট ও বুনিয়াদী ঐক্য আপনি দেখতে পান না কেন, যার ভিত্তিতে বিশ্বমানবতা সম্পর্কে একটি পূর্ণ ও ব্যাপক মত গড়ে উঠতে পারে এবং যার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বমানবের একই 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে পারে ? সমগ্র ভৌগলিক, গোত্রীয় ও জাতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও দুনিয়ার সমগ্র মানুষ একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন জীবন যাপন করছে, একই দৈহিক নিয়মে সমস্ত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, একই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দরুন মানবজাতি দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি বলে অভিহিত হয়, সকল মানুষের মধ্যে একই স্বাভাবিক অনুভূতি, চেতনা ও ভাবধারা বিদ্যমান সকল মানুষের মধ্যে একই প্রকার আত্মশক্তি বর্তমান এবং মানব জীবনে যেসব স্বাভাবিক, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে তাও সম্পূর্ণ এক ধরনের। এটা যদি সত্য হয়—কে বলতে পারে যে, এটা সত্য নয় ?—তাহলে যে নীতি বা আদর্শ মানুষ হিসেবে সমগ্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে তা সার্বজনীন ও বিশ্ব ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার জাতিগত, গোত্রীয় কিংবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভিন্ন হওয়ার কোনোই কারণ নেই। অবশ্য বিভিন্ন জাতি এবং গোত্র সে মূলনীতির অধীন নিজেদের বিশিষ্ট ভাবধারার প্রকাশ করতে

পারে এবং আংশিকভাবে তাদের নিজেদের কাজ-কর্ম বিভিন্ন পন্থায় আঞ্জাম দিতে পারে—এটা করাও তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে যে বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাকে নিশ্চিতরূপে এক ও অভিন্ন হতে হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এক জাতির পক্ষে যা সত্য, অন্য জাতির পক্ষে তা মিথ্যা হওয়া, পক্ষান্তরে এক জাতির জন্য যা মিথ্যা, অন্য জাতির পক্ষে তা সত্য হওয়ার কথা মানুষের সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না।

জীবনের কালগত বিভাগ

আর এক শ্রেণীর লোক মানব জীবনের কালগত বিভাগ করতে প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের বক্তব্য এই যে, কালের এক অধ্যায় মানুষের পক্ষে যে জীবন ব্যবস্থা সত্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয় পরবর্তী অধ্যায়ে তাই বাতিল ও বর্জনীয় হয়ে পড়ে। কারণ, তাদের মতে জীবনের সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো প্রত্যেক যুগেই পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে এবং এ সমস্যা ও ব্যাপারগুলোর প্রকৃত রূপের উপরই জীবন ব্যবস্থা সত্য কিংবা বাতিল হওয়া নির্ভর করে। বস্তুত এ উদ্ভট মতবাদকে নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের চরম নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক মতবাদ পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথেই প্রচার করা হয়। এটা আরো ভয়ংকররূপে মারাত্মক। এ ধরনের মতবাদ যে মানব জীবন সম্বন্ধে প্রচার করা হয়, সে সম্পর্কে সাথে সাথে আবার ক্রমবিকাশবাদের কথাও বলা হয় এবং ইতিহাসে তার সক্রিয় নিয়মগুলোও অনুসন্ধান করা হয়। সে জীবনের অতীত অভিজ্ঞতাসমূহ হতে বর্তমানের জন্য শিক্ষা এবং

ভবিষ্যতের জন্য নীতি ও নিয়ম-কানুনও রচনা করা হচ্ছে। মানুষের জীবনে 'মানব প্রকৃতি' নামে একটি বস্তু আছে একথাও খুব জোর গলায় প্রচার করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, মানব জাতির এ অব্যাহত ঐতিহাসিক গতিধারায় কাল-অধ্যায় কিংবা যুগের সীমা নির্দেশ করার কোনো বিশ্বস্ত যন্ত্র বা মানদণ্ড আপনাদের কাছে আছে কি ? সে নির্দিষ্ট সীমাগুলোর মধ্যে কোনো একটি সীমার উপর অংগুলি নির্দেশ করে আপনি কি বলতে পারেন যে, এ সীমার ওপারে জীবনের যে সমস্যা ছিল, এপারে এসে তা আমুল বদলিয়ে গেছে ? এবং ওপারে জীবনকে যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, এপারে এসে তা সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে ? মানুষের জীবনকে এরূপ বিভিন্ন কালগত খণ্ডে বিভক্ত করা যদি বাস্তবিকই সম্ভব হয় তাহলে বলতেই হবে যে, জীবনের অতীত অংশ পরবর্তী অংশের পক্ষে একেবারে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। কালের সে অংশে মানুষ যা কিছুই করেছে, তা অতীত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের সেই সমস্ত কীর্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কালের সে অধ্যায়ে মানুষ যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, পরবর্তী অধ্যায়ে সে তা হতে কোনো শিক্ষাই লাভ করতে পারে না। কারণ মানুষ কালের এ অধ্যায়ে যে পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ পন্থা ও নীতি গ্রহণ করে এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, পরবর্তীকালে তা সবই ফুরিয়ে গেছে। কাজেই সে অভিজ্ঞতা জীবনের এ পরবর্তী অধ্যায়ে কোনো শিক্ষাই দিতে পারে না। তা যদি সত্য হয় তবে জিজ্ঞেস করে, এ ক্রমবিকাশবাদের কথা এত জোর গলায় কেন বলা হয় ? জীবনের জন্য নিয়ম-কানুনের এরূপ অনুসন্ধিৎসা কেন ? এ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের যৌক্তিকতা

কি? বস্তুত ক্রমবিকাশবাদকে যদি স্বীকারই করা হয়, তবে একথা মানতেই হবে যে, একটি নির্দিষ্ট জিনিস এহেন বিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে বর্তমান আছে এবং পরিবর্তনের দুর্বার স্রোতধারার মধ্যেও নিজেকে অক্ষত রেখে অব্যাহত গতিতে ছুটে চলেছে। আপনি যখন জীবনের নিয়মাবলীর কথা আলোচনা করবেন, তখন আপনাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে, এ গতিমান অভিব্যক্তিকে, এ ভাংগা-গড়ার আবেষ্টনীর মধ্যে এমন একটি স্থায়ী ও চিরঞ্জীব সত্য বর্তমান আছে যার নিজস্ব একটি প্রকৃতি এবং স্বকীয় কোনো নিয়ম- পদ্ধতি বর্তমান রয়েছে। আপনারা যখন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান করে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তখন তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ পথে যে পথিক কালের বিভিন্ন অধ্যায় অতিক্রম করে এসেছে, তার নিজস্ব কোনো সত্ত্বা এবং স্বকীয় কোনো প্রকৃতি বর্তমান আছে—যে সম্পর্কে বলা যায় যে, তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কাজ করে ; এক সময় তা কোনো কোনো জিনিস গ্রহণ করে, অন্য সময় আবার সেই জিনিসকেই বাতিল করে দিয়ে অপর একটি জিনিস পেতে চায়। এ জীবন্ত সত্য, এ স্থায়ী বিবর্তনশীল বস্তু, ইতিহাস-রাজপথের এ চিরন্তন মুসাফিরকেই সম্ভবত আপনারা 'মানবতা' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু আপনি যখন পথের বিভিন্ন মঞ্জিল, সে মঞ্জিলসমূহের বিভিন্ন অবস্থা এবং তা হতে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন, তখন সে কথায় এমনভাবে তন্ময় হয়ে যান যে, তখন স্বয়ং পথিকের কথা একেবারেই ভুলে যান। জিজ্ঞেস করি, পথের মঞ্জিল, তার অবস্থাসমূহ এবং সে অবস্থা হতে উদ্ভূত সময়গুলো পরিবর্তিত হয়ে গেলে স্বয়ং পথিক এবং তার অন্তর্ভুক্ত নিগূঢ় সত্যও কি পরিবর্তিত

হয়ে যায় ? আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, সৃষ্টির শুরু হতে আজ পর্যন্ত তার কাঠামো ও প্রকৃতি মোটেই বদলিয়ে যায়নি। হাজার বছর পূর্বে মানবসৃষ্টির যে উপাদান ছিল, আজও ঠিক তাই বর্তমান। তার প্রকৃতি ও স্বভাব, স্বভাবের অভিব্যক্তি, তার শক্তি ও গুণাগুণ, তার দুর্বলতা ও ক্ষমতা, তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, তার গ্রহণ ও বর্জন, তার উপর প্রভাবশীল শক্তিনির্চয় এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশ—সবকিছুই যথাপূর্ব বর্তমান আছে ; এসবের কোনো কিছুতেই সৃষ্টির প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত একবিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এমন দাবী করার দুঃসাহস কেউই করতে পারে না যে, ইতিহাসের এ দীর্ঘ ও একটানা পথে বিভিন্ন অবস্থা ও সে অবস্থাসমূহ হতে উদ্ভূত জীবন সমস্যার পরিবর্তনের ফলে স্বয়ং 'মানবতা'ও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে কিংবা মানবতার সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়সমূহও পরিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এমন দাবী করা একেবারেই অর্থহীন যে, 'মানবতার' পক্ষে গতকাল যা বিষবৎ ছিল, আজ তা অমৃত হয়ে গেছে, কাল যা সত্য ছিল, আজ তা মূল্যহীন হয়ে গেছে।

মানুষের প্রয়োজনীয় জীবন ব্যবস্থার রূপ

বস্তুত ব্যক্তি মানুষ ও সমষ্টিগত মানুষ ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানবতাকে এবং তৎসংশ্লিষ্ট মৌলিক বস্তুগুলোকে বুঝতে ভুল করে কোনো কোনো সত্য স্বীকার করার ব্যাপারে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের আতিশয্য দেখিয়ে এবং কোনো কোনোটিকে অনুভব করতে অসমর্থ হয়ে সময়ে সময়ে যেসব জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং মহান মানবতা (Humanity at Large) যেগুলোকে

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরে ভুল দেখতে পেয়ে তা ত্যাগ করতে এবং এ ধরনের নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেসবের পরিপ্রেক্ষিতে তারা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে যে, মানবতার জন্য প্রত্যেক নূতন যুগে নূতন এক জীবন ব্যবস্থা আবশ্যক—যা কেবল সে যুগের অবস্থা ও সমস্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলোর সমাধান করতে সচেষ্ট। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা হতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিসংগত যে, এ ধরনের কালগত ও যুগগত জীবন ব্যবস্থা—অন্য কথায় মৌসুমী ফসলকে বারবার পরীক্ষা ও যাচাই করায় এবং প্রত্যেকটির ব্যর্থতার পরে অপর একটির পরীক্ষা করায় মহান মানবতার বহু মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয়ে যায়, তারপর বন্ধুর হয় তার ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে তার গতি ব্যাহত হয়। আসলে বিরাট মানবতার জন্য প্রয়োজন—অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন এমন একটি জীবন ব্যবস্থার যাকে জেনে বুঝে এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব অনুধাবন করে এক ব্যাপক, সার্বজনীন, চিরস্থায়ী ও সনাতন নীতির বুনিয়াদ কায়েম করা যেতে পারে—যাকে নিয়ে মানবতা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র বিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে অতীব স্বচ্ছন্দ গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারে—সে পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করাও সম্ভব হয়—জীবনের রাজপথে সংকুচিত হয়ে নয়, বরং অব্যাহত গতিতে তার মঞ্জিলে মকসুদে গিয়ে উপনীত হতে পারে।

এ রূপ জীবন ব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই রচনা করতে সক্ষম ?

মানুষের জন্য 'দ্বীন' বা জীবন পদ্ধতি একান্তভাবে অপরিহার্য, উপরে তার বাস্তব রূপ এবং পরিচয় দেয়া হয়েছে। এখন আমাদের

বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে যে, এ ধরনের কোনো জীবন ব্যবস্থা যদি মানুষ নিজেই—আল্লাহ্‌র সহায়তা ভিন্ন রচনা করতে চেষ্টা করে, তবে সে চেষ্টা কোনোক্রমেই কি সফল হতে পারে ? ইতিপূর্বে মানুষ এমন কোনো জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন আমি আপনাদের কাছে করবো না ; কারণ তার উত্তরে আপনাদের সকলকেই নিশ্চিতরূপে 'না' বলতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান যুগে যারা বড় গলায় নিজেদের রচিত 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা পেশ করছে এবং সেজন্য পরস্পর মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে, তারাও এমন দাবী করতে পারে না যে, তাদের কারো 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা মানুষ হিসাবে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কারো 'দ্বীন' গোত্রীয় ও জাতিগত, কারো 'দ্বীন' বিশেষ কোনো ভৌগলিক অঞ্চলের জন্য, কারো 'দ্বীন' শ্রেণীগত কারো 'দ্বীন' অতীত এক যুগের প্রয়োজন অনুসারে রচিত হয়েছিল। কাজেই তা অনাগত যুগের অবস্থা ও সমস্যার সমাধানে কিছুমাত্র কার্যকরী হবে কিনা, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ যে যুগ এখন চলছে, তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন এখানো যাচাই করে দেখা হয়নি। কাজেই মানুষ এ ধরনের কোনো জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন আমি করবো না ; আমি জিজ্ঞেস করবো যে, মানুষ এ প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে কি?

বস্তুত এটা অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সুতরাং এ সম্পর্কে ভাসা ভাসাভাবে আলোচনা করা সমীচীন হবে না। কাজেই সর্বপ্রথম ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এখানে যা রচনা করার কথা বলা হচ্ছে, সে জিনিসটি আসলে কি ? এবং যে তা রচনা করতে চায়, তারই বা যোগ্যতা ও ক্ষমতা কতখানি ?

'আ-দ্বীন'-এর পরিচয়

মানুষের জন্য যে 'আ-দ্বীন' বা একমাত্র জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এই মাত্র প্রমাণ করলাম, তা কোনো বিস্তারিত বিধান নয়, তাতে সর্বকালের সমগ্র ছোট-বড় ও খুঁটিনাটি বিষয়ের নির্দেশ বর্তমান থাকার কোনোই আবশ্যকতা নেই। বরং প্রকৃতপক্ষে এ একমাত্র জীবন ব্যবস্থার অর্থ এমন একটি সর্বব্যাপক চিরন্তনী ও মৌলিক বিধান যা সর্বাবস্থায় মানুষের পথনির্দেশ করতে পারে—যা মানুষের চিন্তা ও গবেষণা, চেষ্টা-সাধনা এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারে এবং তাকে ভুল অভিজ্ঞতা অর্জনে সময়, শ্রম, শক্তি ব্যয় হতে রক্ষা করতে পারে। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই যে, মানুষ নিশ্চিতরূপে জেনে নিবে—নিছক আন্দাজ-অনুমান দ্বারা নয়, বরং নিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে জেনে নিবে যে, তার এবং এ বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব কি ? এবং এ বিশাল বিশ্বে তার অবস্থান কোথায় ? তারপর তাকে জানতে হবে—কেবল বুঝে নিলেই চলবে না, খুব ভাল করেই জেনে নিতে হবে যে, এ দুনিয়ার জীবনই কি একমাত্র জীবন, না এটা সমগ্র জীবনের একটি প্রাথমিক অধ্যায় মাত্র ? মানুষের এ অবিশ্রান্ত যাত্রা কি শুধু জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, না ইহজীবন এক সীমাহীন দীর্ঘ সফরের এক অধ্যায় মাত্র ? অতপর তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে জীবনের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে—এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা প্রকৃতপক্ষেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে পারে, যার জন্য মূলত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি দল এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানবতা সকল কালেই, কোনো দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই, নিজ নিজ উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে।

এরপর মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য এমন এক সুদৃঢ় ও সামগ্রিক নিয়ম-পদ্ধতি আবশ্যক, যা প্রকৃতির সমগ্র বৈশিষ্ট্যের সাথে সামস্য স্থাপন করতে পারে এবং সমগ্র সম্ভাব্য অবস্থার উপর কাল্পনিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে খাপ খেতে পারে। কারণ এরূপ হলেই সে এ নিয়ম-পদ্ধতির ভিত্তিতে নিজের স্বভাব-চরিত্র গঠন করতে পারবে, সে নিয়ম-পদ্ধতি পথনির্দেশ জীবন পথের প্রত্যেক মঞ্জিলে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থা ও সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে। ফলে বিবর্তনশীল অবস্থা ও নিত্যঘটিত সমস্যাবলীর সাথে সাথে নতুন নতুন চরিত্রনীতি রচনার আবশ্যক হবে না, অন্য কথায় নীতিহীন ও সুবিধাবাদী (Characterless and Opportunist) হয়ে জীবন যাপন করতে সে বাধ্য হবে না।

তারপর মানুষের জন্য এমন পূর্ণাংগ ও ব্যাপক তামাদ্দুনিক নীতি আবশ্যক, যা মানব সমাজের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য এবং তার সহজাত বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরচিত হবে। তাতে অতিরিক্ত গোঁড়ামী কিংবা শৈথিল্য এবং অসংগত কার্যক্রমের কোনো অবকাশ থাকবে না। তাতে সমগ্র মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ এবং সুবিধার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি থাকবে। তা অনুসরণ করে যেন প্রত্যেক যুগে মানব জীবনের প্রত্যেক দিকের বাস্তব রূপায়ন, পুনর্গঠন এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা সম্ভব হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ, সামাজিক কার্যক্রম এবং চেষ্টা ও সাধনাকে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল পথে পরিচালনা এবং ভ্রান্ত পথের মারাত্মক পরিণতি হতে রক্ষা করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা আবশ্যক, যা জীবনের বিশাল রাজপথে পথ চিহ্নরূপে প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক চৌমাথায় এবং সংকট ক্ষেত্রে তাকে সজাগ ও

সচেতন করে দিবে এবং বলতে পারবে যে, তোমার পথ ঐদিকে নয়, এদিকে।

মানুষের জন্য কতকগুলো সুস্পষ্ট কর্মনীতিও আবশ্যক যা সে সার্বজনীন চিরস্থায়ী পন্থা হিসাবে অনুসরণ করতে পারবে এবং যা এ 'আ-দ্বীন' নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক নীতি এবং কর্মসীমার সাথে মানুষের জীবনকে যুক্ত করে রাখতে পারবে।

এ ধরনের জীবন পদ্ধতি রচনা করার প্রশ্ন মানুষের সম্মুখে উপস্থিত। এখন বিশেষভাবে চিন্তা করতে হতো যে, এ ধরনের কোনো 'আ-দ্বীন' বা জীবন বিধান রচনা করার মত যোগ্যতা, ক্ষমতা বা উপায় উপাদান সত্যিই মানুষের আয়ত্তাধীন আছে কি ?

মানুষের উপায় উপাদানের বিশ্লেষণ

মানুষের জন্য 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা রচনা করার মাত্র চারটি উপায় ও পন্থা মানুষের আয়ত্তাধীন রয়েছে। প্রথম উপায় হচ্ছে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় মানুষের বুদ্ধি, তৃতীয়, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চতুর্থ হচ্ছে অতীত অভিজ্ঞতাসমূহের ঐতিহাসিক সম্পদ। এ চারটি উপায় ছাড়া কোনো পঞ্চম উপায় নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। এ চারটি উপায়ের যতদূর যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হতে পারে, তা আপনি পরীক্ষা করে দেখুন এবং বিচার করে দেখুন, এসব উপায়ের সাহায্যে মানুষের জন্য 'আ-দ্বীন' বা একমাত্র জীবন ব্যবস্থা রচনা করা কি কোনো প্রকারেই সম্ভব হতে পারে ? ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার জীবনের একটি বিরাট অংশ এসব বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ও যাচাই পরীক্ষার কাজে অতিবাহিত করেছি এবং সর্বশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়েছি যে, এ উপায়গুলো মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনায় কিছুমাত্র সহায়তা করতে পারে না। অবশ্য কোনো মানবাতীত সত্তা পথপ্রদর্শক হয়ে যদি মানুষের সম্মুখে কোনো জীবন ব্যবস্থা উপস্থিত করে তবে তা বুঝতে, হৃদয়ংগম করতে, পরীক্ষা ও যাচাই করতে এবং তদনুযায়ী জীবনের বিস্তারিত বিধান সময় ও কর্মোপযোগী করে রচনা করতে এসব মানবীয় উপায় অবশ্যই কিছু না কিছু করতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্য প্রয়োজন 'আ-দ্বীন' বা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য এসবের কোনো ক্ষমতাই নেই।

ইচ্ছাশক্তি

প্রথমে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে ? এ শক্তিটি যদিও মানুষের প্রেরণা লাভের প্রকৃত উৎস উদ্বোধক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মূল প্রকৃতিতে যেসব দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে, তার কারণে এটা কিছুতেই মানুষের পথপ্রদর্শন করার যোগ্য হতে পারে না। শুধু পথপ্রদর্শন করাতো দূরের কথা, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে পর্যন্ত অনেক বিভ্রান্ত করে থাকে। নানাবিধ শিক্ষা-দীক্ষা ও ট্রেনিং দেয়ার পর এ শক্তিকে যতদূরই আধুনিক, তেজস্বী ও জ্যোতিষ্মান করে তোলা হোক না কেন, কোনো গুরুতর ব্যাপার শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব এর উপর যখনই ন্যস্ত করা হবে, তখনি এটা শতকরা অন্তত নিরানব্বইটি অবস্থায় ভ্রান্তিপূর্ণ ফায়সালা দিবে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এর অভ্যন্তরে যেসব ভাবধারা বর্তমান পাওয়া যায়, তা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে না, বরং বাঞ্চিতকে কোনো না কোনো প্রকারে অবিলম্বে লাভ করার জন্য অনুকুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এটা মানুষের

ইচ্ছাশক্তির স্বাভাবিক দুর্বলতা বিশেষ। কাজেই এ শক্তি একজন ব্যক্তিরই হোক কিংবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর হোক অথবা রুশোর কথা অনুযায়ী সার্বজনীন ইচ্ছাশক্তি (General Will) হোক না কেন, মানুষের জন্য কোনো পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনার উপযোগী যোগ্যতা স্বভাবতই কোনো ইচ্ছাশক্তির নেই। অধিকন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি মানব জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, তার লক্ষ্য, গতি ও পরিণতি সম্পর্কীয় উচ্চতর সমস্যাগুলোর (Utimate Problemৃ) কোনো সমাধানই দান করতে পারে না।

বুদ্ধি

এখন মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক। বুদ্ধির ক্ষমতা অসাধারণ, তার যোগ্যতা ও প্রতিভা অনস্বীকার্য। মানব জীবনে তার গুরুত্ব এবং মর্যাদাও কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। পরন্তু মানুষের অভ্যন্তরে এটা অত্যন্ত তীব্র প্রেরণাদায়ক শক্তি, তাও স্বীকার না করে উপায় নেই ; কিন্তু সমস্যা এই যে, মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হলে তা করবে কার বুদ্ধি ? ---- জায়েদের বুদ্ধি --- না বকরের বুদ্ধি ? না সমগ্র মানুষের বুদ্ধি ? ------ না মানুষের বিশেষ কোনো দল বা শ্রেণীর বুদ্ধি ? --- বর্তমান যুগের মানুষের বুদ্ধি ?-- না অতীত কোনো যুগের মানুষের বুদ্ধি ? ----- কি অনাগত যুগের মানুষের বুদ্ধি ? --- আর এ প্রশ্ন না হয় না-ই করলাম, কারণ এর সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এ প্রসংগে সহজ একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে চাই। মানব বুদ্ধির চৌহদ্দি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখলে মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনা করার মত বিরাট ও জটিল কাজ তার উপর ন্যস্ত করা কি কোনো রকমেই শোভা পায় ?

বস্তুত কোনো কিছু সম্পর্কে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্তরূপে নির্ভর করে পঞ্চইন্দ্রিয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর। এটা ভুল তথ্য সংগ্রহ করলে বুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য। তা অসম্পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করলে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণই হবে এবং যেসব ব্যাপারে ইন্দ্রিয় কোনো তথ্যই সংগ্রহ করতে পারবে না, বুদ্ধির আত্মজ্ঞান থাকলে সেসব ব্যাপারে তা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করারই দুঃসাহস করবে না। আর তা অন্ধ ও দাম্ভিক হলে অন্ধকারে কাষ্ঠ নির্মিত তীর নিক্ষেপ করে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। যে বুদ্ধির পরিধি এত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ, মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনা করার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা কিছুতেই সমীচিন হতে পারে না। ব্যবস্থা রচনার জন্য গোড়াতেই যে উচ্চতর সমস্যাগুলোর সমাধান অপরিহার্য, ইন্দ্রিয়নিচয় তার একটিরও কোনো সমাধান পেশ করতে পারে না। তবে কি এসব সমস্যার সমাধান করা হবে অবাস্তব ধারণা-বিশ্বাস, অমূলক কল্পনা-খেয়াল এবং কুসংস্কার ও আজগুবী কিচ্ছা-কাহিনীর উপর নির্ভর করে? 'আ-দ্বীন' বা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রচনার জন্য যেসব স্থায়ী নৈতিক মূল্য নির্ধারণ সংগ্রহ করতে একেবারে অক্ষম। এমতাবস্থায় মানব বুদ্ধি, বিশুদ্ধ, খাঁটি ও পরিপূর্ণ নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হবে বলে কিছুমাত্র ভরসা করা যায় কি? তদ্রূপ জীবন ব্যবস্থা (আ-দ্বীন) রচনার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আমি উল্লেখ করেছি, তার জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্ভুল, বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই মানব বুদ্ধি কেন ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু মানব বুদ্ধির সাথে ইচ্ছাশক্তি বলতে আর একটা বস্তু শনিগ্রহের ন্যায় স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিরাজ করছে। তা বুদ্ধিকে কোনো সুষ্ঠু ও

বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রতি পদক্ষেপে বাধা প্রদান করে এবং তাকে সহজ ও সঠিক পথে চলার গতি ব্যাহত করে বাঁকা ও ভুল পথে পরিচালিত না করে ছাড়ে না। কাজেই মাবব বুদ্ধি ইন্দ্রিয়নিচয়ের সংগৃহীত তথ্যের সুবিন্যাসে এবং তা দ্বারা যুক্তি প্রদান করার ব্যাপারে কোনোরূপ ভুল করবে না বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তবুও তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা নিবন্ধন জীবন ব্যবস্থা রচনার ন্যায় বিরাট দায়িত্ব বহন করার কোনো ক্ষমতাই নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ। এ দায়িত্ব তার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিলে এক দিকে যেমন তার উপর যুলুম করা হবে, অন্যদিকে নিজের উপরও কম যুলুম করা হবে না।

বিজ্ঞান

এখন তৃতীয় উপায়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। এ জ্ঞানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যাপারে বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র অপেক্ষা আমি পশ্চাদপদ নই এবং তার একবিন্দু অবমাননাও আমি মোটেই পসন্দ করি না। কিন্তু তার স্বাভাবিক সসীমতাকে উপেক্ষা করে তাকে অধিকতর প্রশস্ত, বিশাল ও অসীম শক্তিসম্পন্ন মনে করাকে আমি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক আচরণ বলে আখ্যা না দিয়ে পারি না। কারণ বিজ্ঞানে মূলতই সে শক্তি বর্তমান নেই। মানব বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, অতি প্রাকৃতিক ও জড় অতীত সমস্যাবলী সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। যেহেতু সেই নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যের জগতে পৌঁছবার কোনো অবলম্বন আসলেই মানুষের করায়ত্বে নয়। অধিকন্তু তার প্রত্যক্ষ ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার

এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান রাশির সাহায্যে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই, যাকে কোনোরূপ 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। জীবন ব্যবস্থা (আ-দ্বীন) রচনার জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা করা সর্বপ্রথম অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে অবস্থিত। তারপরে নৈতিক মান নির্ধারণ, তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির মূলনীতি নির্বাচন এবং ভ্রান্ত পথ হতে বিরত রাখার জন্য সীমা নির্দেশ করার কর্তব্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধা করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন অবশ্য জাগতে পারে। কিন্তু তার উপর পাল্টা প্রশ্ন এ উঠবে যে, তা যদি সম্ভব বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ দলের অথবা কোন্ কালের বিজ্ঞান এ কাজ সমাধা করবে ? কাজেই অর্থহীন বিতর্কে না গিয়ে আমরা শুধু নীতি হিসেবে বিষয়টির আলোচনা করে দেখবো। প্রথম আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো যে, নিছক বৈজ্ঞানিক পন্থায় এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কি কি বুনিয়াদী শর্ত রয়েছে। সেজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো মানুষ এ দুনিয়াতে যেসব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বসবাস করছে, সে সমস্ত নিয়মের তত্ত্বজ্ঞানের পরিপূর্ণ সমাহার। তার পরে মানুষের নিজের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা লাভও অত্যাবশ্যক। তৃতীয়ত, এহেন বিশ্ব-প্রাকৃতিক এবং মানবিক এ উভয় প্রকারের জ্ঞান তথ্যের সমাহার একত্রীভূত হওয়াও অপরিহার্য। এবং এমন একটি পরিপূর্ণ মননশক্তির আবশ্যক যা এ তথ্য সমাহারকে পরস্পর শ্রেণীবিন্যাস করে, তা দ্বারা সুষ্ঠু নিয়মে যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের জন্য নৈতিক মূল্য সমাজ ও তামাদ্দুনিক নীতি নির্ধারণ এবং সর্বপ্রকার ভুল, ভ্রান্তি হতে তাকে বাঁচাবার উপায় নির্দেশ করার কাজ করবে। কিন্তু সত্য বলতে কি, এ

শর্তগুলো পূরণ করা, এতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সংগ্রহ করা যেমন আজ পর্যন্ত আদৌ সম্ভব হয়নি। অনুরূপ আরো পাঁচ হাজার বছর পরেও তা কখনো সম্ভব হতে পারে বলে কোনো আশাও করা যায় না। অবশ্য দুনিয়ার সাথে সাথে গোটা মানবতার ধ্বংস প্রাপ্তির একদিন পূর্বে তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু তখন আর সেগুলোর কোনোই সার্থকতা থাকবে না।

ইতিহাস

মানুষের জ্ঞান অর্জনের সর্বশেষ উপায় হচ্ছে ইতিহাস। অন্য কথায় তাকে বলা যেতে পারে, অতীত মানুষের অভিজ্ঞতাসমূহের ঐতিহাসিক সঞ্চয় কিংবা আমলনামা। এ জিনিসটির গুরুত্ব ও সার্থকতা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তবুও আমি একথা বলতে চাই—একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আপনিও তা বলতে বাধ্য হবেন যে, মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনার মত বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পদ মোটেই যথেষ্ট নয়। অতীতকাল হতে ইতিহাসের এ সম্পদ পূর্ণ বিশুদ্ধতা ও ব্যাপকতার সাথে আমাদের নিকট পৌঁছেছে কিনা, সে প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না। পরন্তু, এহেন ঐতিহাসিক সম্পদের সাহায্যে মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করবে কোন্ ব্যক্তি ?-- হেগেল ? ---- না মার্কস ? ----- না আর্নেষ্ট হেইকল ? --- না অন্য কেউ ? --- এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করবো না। আমি শুধু এটাই জিজ্ঞেস করতে চাই যে, অতীত, বর্তমান, কিংবা ভবিষ্যতের কোন্ তারিখ পর্যন্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে ? তেমন কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করা যদি বাস্তবিকই সম্ভব হয়, তবে বলতেই হবে যে, তার

পরবর্তীকালের মানুষ বড়ই ভাগ্যবান। আর পূর্বে যারা চলে গেছে, তাদের কথা আমাদের ভাবার প্রয়োজন নেই।

নৈরাশ্যের অন্ধকার

মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনা করার জন্য অপরিহার্য মানবীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ করলাম। আমার বিশ্বাস এ আলোচনা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমি বিজ্ঞান বা যুক্তি প্রয়োগের দিক দিয়ে কোনো ভুল করিনি। মানুষের জ্ঞান লাভের উপায়সমূহের যে বিশ্লেষণ আমি করলাম, তা যদি সত্য হয়, তাহলে এখন আমি আমার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারি। উপরোক্ত কারণে আমার দৃঢ় ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস জন্মেছে (এবং এ বিশ্বাস নষ্ট করার কোনো কারণই থাকতে পারে না) যে, মানুষ নিজের জন্য এসব উপায়ের সাহায্যে অসম্পূর্ণ অবাস্তব, ভুল-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ আঞ্চলিক কিংবা সাময়িক কোনো ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হতেও পারে ; কিন্তু মানুষের পক্ষে এ উপায়ে কোনো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (الدين) রচনা করা একেবারেই অসম্ভব—পূর্বেও তা সম্ভব ছিল না, আজও সম্ভব নয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও এর সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এখন মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য যদি সত্যই কোনো 'রব' বর্তমান না থাকে–আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের যেমন ধারণা—তবে তার আত্মহত্যা করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ই থাকে না। যে পথিকের কোনো পথপ্রদর্শক নেই, যে নিজে পথ চেনে না, পথ চিনার কোনো উপায়ও যার জানা নেই, তার পক্ষে চরম ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় তার একজন হিতাকাংখী ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্য রাজপথে

পাথরের সাথে মাথা ঠুকে সকল মুশকিল আসান করার উপদেশ দেয়া ছাড়া তার আর কিই বা উপকার করতে পারে ! আর 'আল্লাহ' বলতে যদি সত্যিই কেউ থাকে, কিংবা থেকেও যদি সে মানুষের কর্মজীবনের পথ বাতলিয়ে দিতে সমর্থ না হয় কোনো কোনো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের যেমন বিশ্বাস—তবে এটা আরো অধিকতর দুঃখের বিষয়। যে আল্লাহ্ দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুর স্থিতি, পরিবর্ধন ও ক্রমবিকাশ লাভের জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেই আল্লাহ-ই যদি মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় জিনিসটি না দিয়ে থাকেন—যা না হলে মানুষের জীবন একেবারে অর্থহীন, সেই জিনিসের কোনো ব্যবস্থাই যদি তিনি না করে থাকেন, তবে তাঁর সৃষ্টি এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে মানুষের এ জীবন একটি দুরূহ জীবন এবং একটি মস্তবড় বিপদ বিশেষ হয়ে পড়ে,—এমনি বিপদ যা অপেক্ষা বড় বিপদ আর কিছু ধারণা করাও যায় না। এমতাবস্থায় গরীব, দুঃখী, সর্বহারা, রুগ্ন, আহত, মজলুম ও শোষিত জনতার দুঃখের জন্য কেঁদে কি হবে, একান্তই যদি কাঁদতে হয়, তবে এই গোটা মানবতার সীমাহীন দুঃখের জন্য কাঁদুন। এমতাবস্থায় বলতে হবে যে, মানুষকে এক অন্তহীন দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অবস্থা এই হয়েছে যে, সে বারবার ভুল অভিজ্ঞতা লাভ করে ব্যর্থ হয়। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে পড়ে যায়, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, আবার উঠে চলতে শুরু করে ; কিন্তু পুনরায় সে আঘাত খেয়ে ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক আঘাতে দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি তাবাহ্ ও বরবাদ হয়ে যায়। বড়ই দুঃখের বিষয় এ অর্বাচীন মানুষ এতটুকুও জানে না যে, তার জীবন ও জন্মের উদ্দেশ্য কি ? সে কিসের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করবে, সাধনা করবে, শ্রম

ও কষ্ট স্বীকার করবে আর তা সে করবেই বা কোন্ প্রণালী ও পদ্ধতি অনুসারে এতটুকু পর্যন্ত তার জানা নেই। কিন্তু মানবতার এ মর্মান্তিক দূরবস্থা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই আল্লাহ যিনি মানুষকে এ দুনিয়াতে সৃষ্টি করেই কি ক্ষান্ত হয়েছে, তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার কোনো দায়িত্বই কি তাঁর নেই ?

আশার একটি আলোক রেখা

কুরআন শরীফ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। উপরে মানুষের যে চরম দূরবস্থার কথা বলা হয়েছে, কুরআন শরীফ তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক নূতন তত্ত্বের দ্বার উদঘাটিত করেছে। কুরআন বলছেঃ আল্লাহ তাআলা শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, মানুষকে সৎপথের সন্ধানদাতাও তিনি। তিনি বস্তুজগতের প্রত্যেকটি জিনিসকে তার প্রকৃতির প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে হেদায়াত দান করেছেন ঃ

اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -

এ হেদায়াত দান যে কতখানি সত্য, যে কোনো পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা কিংবা মাকড়সা ধরে দেখলেই তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকে যেরূপ জন্মগতভাবেই পথের সন্ধান জানিয়ে দিয়েছেন—শিখিয়ে দিয়েছেন তাদের কাজ এবং কাজের পন্থা, সেরূপ তিনি মানুষের কর্মজীবনের জন্য পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন কাজেই নিজের সর্বপ্রথম অহমিকা ভুলে গিয়ে সে আল্লাহর সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা এবং তার পয়গাম্বরদের মারফত যে ব্যাপক জীবন ব্যস্থা (الدين) তিনি নাযিল করেছেন, তা অনুসরণ করাই মানুষের পক্ষে একান্তভাবে কর্তব্য।

এখন দু'টি সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত ঃ একটি মানুষের যাবতীয় শক্তি সামর্থ এবং তার জ্ঞান লাভের সমগ্র উপায়-

উপাদানের বিশ্লেষণ করার পর লাভ হয়েছে, আর অন্যটি পাচ্ছে কুরআনের সিদ্ধান্ত। এখন দুনিয়ার মানুষের পক্ষে হয় কুরআনের বাণী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তাকে এমন এক নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, যেখানে আশার কোনো আলোক রেখাই বিচ্ছুরিত হয় না। 'আ-দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা লাভের জন্য মানুষের সামনে যদি দু'টি উপায় থাকতো এবং যদি প্রশ্ন করা হতো যে, মানুষ এ দু'টির কোন্‌টিকে গ্রহণ করবে, তবে অবশ্য অনেক সুবিধা ছিল। মূলত এখানে মোটেই সেই ব্যাপার নয়—সে প্রশ্নও এখানে নয়।

এখানে আসল ব্যাপার এই যে, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (الدين) মানুষ কেবল একটি উপায়েই লাভ করতে পারে। এখন মানুষের সামনে এ প্রশ্ন মাথা জাগিয়ে উঠেছে যে, মানুষ এই একমাত্র উপায়ের সাহায্যে প্রাপ্ত জীবন গ্রহণ করবে, না এই একমাত্র পন্থার আশ্রয় অস্বীকার করে জাহেলিয়াত ও নিরুদ্দেশের অন্ধকারে জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত করবে ? এ দু'টি পথের যে কোনো একটিকে মানুষ অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে—তাকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে মাত্র।

কুরআনের যুক্তি

এই পর্যন্ত যতকিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা হতে আমরা শুধু এ সিদ্ধান্তই লাভ করতে পারি যে, কুরআনের দাবী এবং তার প্রদর্শিত পথ গ্রহণ না করে মানুষের সর্বকালীন কল্যাণ লাভের জন্য কোনো উপায় নেই। অন্য কথায় বলা যায়, "কাফের হওয়ার তো উপায় নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে মুসলমান হও।" কিন্তু কুরআন নিজের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করেছে,

তা এ বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির অনেক উর্ধে তা অনেক সারগর্ভ ও অকাট্য। কুরআন মানুষকে ঠেকে মুসলমান হতে বলেনি। তার পরিবর্তে সে মানুষকে নিজ ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় মুসলমান হবার উৎসাহ দিয়েছে। কুরআনের যুক্তিগুলোই মানুষের মনে এ আগ্রহের সঞ্চার করে। কুরআনের এ সম্পর্কীয় প্রমাণগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি। এজন্য চারটিকেই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এক ঃ মানুষের জন্য ইসলামই একমাত্র সঠিক জীবন ব্যবস্থা। কারণ এটাই প্রকৃত তত্ত্ব এবং আসল সত্যের অনুরূপ। এছাড়া অন্য সব পন্থা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ (ال عمران : ٨٣)

"এরা কি আল্লাহ তাআলার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) ছাড়া অন্য কোনো পন্থা পেতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সেই এক আল্লাহরই সামনে নত হয়ে আছে এবং শেষকালে সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

দুই ঃ মানুষের জন্য এটাই একমাত্র সঠিক এবং নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা, কারণ এটাই একমাত্র সত্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে এছাড়া কোনো পন্থাই নির্ভুল ও খাঁটি হতে পারে না।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا

وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍۢ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের 'রব' মালিক ও বাদশাহ্ হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে কালের দু'টি অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পর তিনি নিজ 'সিংহাসনে' আরোহণ করেন। তিনি দিনকে রাতের পোশাক পরিয়ে দেন এবং তার পর রাতের পশ্চাতে দিন খুব দ্রুত গতিতে চলে আসে। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সবকিছুই তাঁর অধীন ও অনুগত। শুনে রাখ, সৃষ্টি তাঁরই এবং আইন-শাসনও কেবল তাঁরই চলবে। ---- সারে জাহানের 'রব' আল্লাহ্ বড়ই মহান।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪)

তিন ঃ মানুষের পক্ষে এ পন্থাই ঠিক পন্থা, এটাই খাঁটি পথ। সমগ্র সত্য সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই থাকতে পারে এবং নির্ভুল বিধানও কেবল তিনিই দিতে পারেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاۤءِ ـ(ال عمران : ٥)

বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীর কোনো জিনিসই আল্লাহর অগোচরে নয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ ـ(البقرة : ٢٥٥)

"তিনি মানুষের সম্মুখে যা আছে তাও জানেন, আর যা তাদের অগোচরে ও অজ্ঞাত তাও তিনি জানেন। মানুষ তার জ্ঞানকে কোনোক্রমেই আয়ত্ত করতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ নিজেই যদি কোনো জ্ঞান মানুষকে দান করেন, তবে সেই কথা স্বতন্ত্র।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط -(الانعام : ٧١)

"হে নবী ! বলে দাও যে, আল্লাহর হেদায়াতই মানুষের জন্য একমাত্র সত্য পথ-নির্দেশকারী বিধান।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ৭১)

চার ঃ মানুষের জন্য এটাই একমাত্র সঠিক পথ। যেহেতু এ পথ ছাড়া প্রকৃত সুবিচার স্থাপন সম্ভব নয়। এটা ছাড়া অন্য যে পথেই মানুষ চলবে একদিন না একদিন তা যুলুমেই রূপান্তরিত হবে।

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তাঁরাই যালেম।"

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের ফায়সালা করে না, তারাই যালেম।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫)

কুরআনের এসব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করা এবং তাঁর নিকট প্রাপ্ত বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করাই প্রত্যেকটি জ্ঞানী লোকের কর্তব্য।

আল্লাহর বিধান পরীক্ষার মাপকাঠি

এখানে এসে প্রত্যেকটি মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কোন্‌টি আল্লাহর বিধান আর কোন্‌টি নয়, তা কিরূপে প্রমাণিত হবে ? এক একজন এসে বলবে এটা আল্লাহর বিধান, এটা গ্রহণ কর, আর অমনিকি আমরা তা গ্রহণ করবো ? ---- যদি তা না হয়, তবে আল্লাহর ব্যবস্থা এবং মানুষের তৈরী ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করার কি মানদণ্ড আছে ? এ প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই জাগতে পারে–জাগা স্বাভাবিক। আমার নিজের মনেই গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এ প্রশ্ন জেগে উঠেছে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হলে বহু দীর্ঘ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তার অবকাশ নেই। এখানে আমি সংক্ষেপে এর জবাব দিতে চেষ্টা করবো।

মানুষের চিন্তা আর আল্লাহর বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য চারটি বড় বড় মাপকাঠি আছে। এখানে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের চিন্তাধারার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি ও সসীমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ব্যবস্থায় সীমাহীন জ্ঞান এবং সঠিক ও নির্ভুল তত্ত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত যে ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ হতে হবে তার কোনো কথাই কোনো কালের বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হবে না কিংবা সেই সম্পর্কে কোনো দিনই একথা বলা যাবে না যে, 'ব্যবস্থাদাতা' ব্যাপারটির সকল দিক যথাযথভাবে বিচার করে দেখেননি। কিন্তু বিশ্লেষণ ও যাচাই করার এ মানদণ্ড প্রয়োগকালে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে,

প্রকৃত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কল্পনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগিতে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। এক যুগে যেসব বৈজ্ঞানিক কল্পনা আর দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে, ভুলবশত প্রায়ই সেগুলোকে 'বিজ্ঞান' বলে মনে করা হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর নির্ভুল হওয়ার যত সম্ভাবনা, ভুল হওয়ারও ঠিক ততদূরই সম্ভাবনা বর্তমান। মানুষের ধারণা-কল্পনা আর মতবাদ শেষ পর্যন্ত নির্ভুল বিজ্ঞান বলে প্রমাণিত হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার নজীর খুব কমই পাওয়া গেছে।

মানুষের চিন্তা-গবেষণার আর একটি মারাত্মক দুর্বলতা হচ্ছে দৃষ্টিভংগীর সসীমতা ও সংকীর্ণতা। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থায় চিন্তা ও দৃষ্টি ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। আল্লাহর ব্যবস্থার যে কোনো ধারাকেই আপনি লক্ষ্য করবেন, নিসন্দেহে আপনার মনে হবে যে, এর ব্যবস্থাপক আদি হতে অন্ত পর্যন্ত নিজ চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছেন। গোটা সৃষ্টিজগতকে দেখছেন, সমগ্র সত্য আর তত্ত্ব সমবেতভাবে তাঁর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এর প্রতিকূলে বড় বড় দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে একটি শিশুর চিন্তা বলে প্রতীয়মান হবে। মানুষের চিন্তার তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, তাতে বিজ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষের আবেগ-উচ্ছাস ও বাসনা-লালসার সাথে কোথাও না কোথাও সন্ধি বা ষড়যন্ত্র করছে বলে পরিস্কার মনে হবে। আল্লাহর ব্যবস্থা এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাতে স্বচ্ছ জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অনাবিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় উজ্জ্বলরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তার আদেশে-নির্দেশে কোথাও আবেগ উচ্ছাস ও একদেশদর্শিতার আবিলতা মোটেই পরিলক্ষিত হবে না।

মানুষের চিন্তার আর একটি দুর্বলতা এই যে, যে জীবন ব্যবস্থা সে নিজে রচনা করবে তাতে পক্ষপাতিত্ব, মানুষে মানুষে অবাঞ্ছনীয়

বৈষম্য এবং অবৈজ্ঞানিক বুনিয়াদে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ভাবধারা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান পাওয়া যাবে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কোনো কোনো মানুষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভাবাবেগের দুর্বলতা থাকেই এবং তার ফলেই মানুষ একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা রচনা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থা এসব কলুষতা হতে সর্বোতভাবে মুক্ত ও পবিত্র।

যেসব জীবন ব্যবস্থা নিজেকে আল্লাহর ব্যবস্থা বা 'আ-দ্বীন' বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট, তার প্রত্যেকটিকেই এ মানদণ্ডে যাচাই করে দেখতে হবে। যদি তা মানবীয় চিন্তা গবেষণার উল্লিখিত বিশেষত্ব হতে মুক্ত হয় তবে তাকে 'আ-দ্বীন' বা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করতে কোনোই আপত্তি থাকতে পারে না।

ঈমানের দাবী

এখন প্রশ্ন এই যে, কুরআনের এই দাবী মানলে এবং যে জীবন বিধান আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে বলে বিশ্বাস হবে তাকে গ্রহণ করলে, মানুষের প্রতি কি কর্তব্য আবর্তিত হয় ? উপসংহারে এ প্রশ্ন সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের অর্থ নত হওয়া, আত্মসর্মপণ করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়া। এ নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণের সাথে আত্মম্ভরিতা এবং চিন্তা ও কর্মের নিরংকুশ আযাদীর কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। যে জীবন ব্যবস্থার প্রতিই মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার নিকট তার সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিতে হবে। জীবনের কোনো ;

একটি ব্যাপারকেও তার বাইরে রাখতে পারবে না। ঈমানের অর্থ এই যে, 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থাই মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে ; এটাই হবে তার চোখ ও কানের ধর্ম, হাত ও পায়ের ধর্ম; পেট ও দেহের ধর্ম, তার কলম ও মুখের ধর্ম, তার আজীবনের চেষ্টা-সাধনা ও কর্মের ধর্ম, ভালবাসা ও ঘৃণার ধর্ম, তার বন্ধুত্ব আর শত্রুতার ধর্ম। মোটকথা মানুষের ব্যক্তি সত্তার কোনো একটি দিক ও বিভাগই এহেন ধর্মের বাইরে থাকতে পারবে না। জীবনের যে কাজ বা দিকই এক দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত হবে এবং যে কাজে বা জীবনের যে দিকেই এ জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ পরিত্যক্ত হবে তার প্রতি ঈমানের দাবীতে ততই মিথ্যা ও প্রতারণার যোগ থাকবে, এতে কিছু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর জীবনকে মিথ্যা ও প্রতারণার কলুষ হতে মুক্ত রাখা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সত্যসন্ধ মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এ পুস্তকের প্রথমদিকে একথাও বলা হয়েছে যে, মানুষের জীবন একটি সামগ্রিক ও অভিন্ন সত্তা ; তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায় না। কাজেই মানুষের পূর্ণ জীবনের জন্য একটি মাত্র ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থাই হতে পারে। একই সময় একাধিক জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা তা করতে গেলে ঈমানের অনিশ্চিত অবস্থা, মতের বিশিষ্টতা ও অসংবদ্ধতা এবং জটিল ব্যাপার সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতাই প্রমাণ হবে। বস্তুত 'কোনো আদর্শকে' যখন মানুষ 'আ-দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার জীবন ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, তখন তা তার পূর্ণ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের 'একমাত্র ব্যবস্থা' হওয়া চাই এবং বাধ্য হওয়াই তাকে এভাবেই গ্রহণ করতে হবে, তাছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাকে যদি ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে তা ঘরের ব্যবস্থা হবে, শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে, তার কায়-কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের, তার ঘরোয়া জীবন এবং জাতীয় কর্মনীতির, তার রাজীনিত ও তামাদ্দুনের, তার সাহিত্য ও শিল্পের ব্যবস্থা হবে, বস্তুত এরূপ না হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না যে, একটা মুক্তাকে যখন আরো অনেক মুক্তার সাথে একই সূত্রে গেথে দেয়া হবে, তখন আর তা মুক্তা থাকবে না। তখন তা ছোলা বুট হয়ে যাবে—এমন কোনো কথাই হতে পারে না। অনুরূপভাবে একথাও যদি আমি বুঝতে পারি না যে, ব্যক্তিগতভাবে তো আমরা একটি ব্যবস্থা অনুসরণ করবো কিন্তু যখন আমাদের একাধিক লোকের জীবনকে সংঘবদ্ধ করবো তখন সেই সংঘবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ জীবনের কোনো কোনো দিক সেই ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকবে।—এ ধরনের কথার অন্তসারশূন্যতা সুস্পষ্ট।

ঈমান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, কোনো ব্যবস্থাকে যখন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা হয়, তখন সমগ্র জাতিকে তার কল্যাণ ও সৌন্দর্য গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া অবশ্য কর্তব্য এবং তাকে সমগ্র দুনিয়ার ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। সত্য যেমন স্বভাবতই সর্বজয়ী হতে চায় তেমনি সত্য প্রেমিকও সত্যকে বাতিলের উপর জয়ী করার জন্য চেষ্টা না করে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখবে যে, বাতিল চারদিক হতে পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধিবাসীগণকে গ্রাস করছে তখন এ দৃশ্য দেখে তার মধ্যে যদি কোনোরূপ ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা, ব্যাথা এবং অস্থিরতা জেগে না উঠে তবে মনে করতে

হবে যে, সত্যের জন্য তার মনে প্রকৃতই কোনো দরদ নেই— সত্যিকার কোনো প্রেম নেই। আর তা থাকলেও একেবারে অচেতন ও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু চেতনা ও অনুভূতির এ নিদ্রা পরিণামে কাল-নিদ্রায় পরিণত না হয়, সময় থাকতেই সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-